চিঠিপত্রে অন্য এক অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

আদিত্য সেন

আমার অনুভবে চিঠিপত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে যত জানা যায়, যত তাঁকে কাছে পাওয়া যায় - এমন আর কিছুতে নয়। অনেকেই চিঠি লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি আমরা দেখেছি এবং বিদ্যাসাগরেরও। কিন্তু চিঠিপত্রে যে একটা সময় ও কালকে ধরে রাখা যায় - রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সেরকম একটা বড় পরিচয় বহন করে। আমরা সমৃদ্ধ হই, ঋদ্ধ হই।

আমরা তো আজকাল সই করা ছাড়া কলম ব্যবহারই করি না। দোয়াত-কলমের যুগ তো কবেই উঠে গেছে। বল-পেনের প্রেমপত্রও দুর্লভ আজকাল, কারণ কলম ধরলে প্রেম জেগে ওঠে কি না জানি না, হালের প্রেমের ঘন্টি বাজে এস.এম.এস-এ। কিংবা তার স্বরূপ ফোটে মোবাইল-ঝংঙ্কারে। ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের ক্ষেত্র সীমিত হতে হতে একদিন হয়তো এমন হবে যে কাল ও সময় বলে কিছু থাকলেও তার কোনো অনুভূতি থাকবে না। মহাকাল তো চিরকালই নীরব ভূমিকা পালন করেন। তাঁর 'কাজ' বলে বোধহয় আর কিছুই থাকবে না। কারণ কেউ যদি কিছু না লেখে তবে তার কালজয়ী হবার তো প্রশ্ন ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের ষোড়শ খণ্ড তো আমার হাতের কাছেই আছে, তারপরে বিশ্বভারতী নিশ্চয় আরও চিঠিপত্র সংকলিত করেছেন। অসংকলিত চিঠিপত্রের সংখ্যা কত তা হয়তো আমরা এখনও জানি না। তবে এ যে-সে চিঠি নয়, এ চিঠি পড়তে পড়তে নিজের অজান্তে কাল হরণ হয়ে যায়, উপন্যাস পড়ার চেয়ে আরও বেশি কিছু পাওয়া যায় যেন। মানুষ তো নিজেকে উজার করে কখনও কথা বলে না, সেই সরলতা এ যুগে আছে কি না সন্দেহ কিন্তু আন্তরিক চিঠিপত্রে আমরা সেই উজার-করা কিছু অনুভূতি ও অনুসন্ধানের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের ৩০শে জুলাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে বলেছিলেন যে, চিঠির মধ্যে একটা 'সৌকুমার্যের ব্যঞ্জনা' আছে — সেটা সব সময় লেখা হয়ে ওঠে না। চিঠি লিখতে লিখতে কেউ যদি 'দৌড় লাগায় চার পা তুলে' তাহলে সেটা আর চিঠি থাকে না, হয়ে যায় 'চিঠা'।

১৮৮৫ সালের ৮ই মার্চ তিনি 'ছিন্নপত্রে', চিঠি যে কত মহামূল্যবান উপহার তার কার্যকারণ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'চিঠির মধ্যে যে অতিরিক্ত রস আছে তা আলাপচারিতায় নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পৃথিবীতে অনেক মহামূল্যবান উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানা কম জিনিস নয়।... আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্রদ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি।... মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ঠিক ততখানি করে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘন্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি-লেখালেখির অবসর ঘটে নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।'...

আর একবার, (সাল ও তারিখটা ঠিক জানা যায় না) স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর কাছ থেকে সেদিন চিঠি পাবেন মনে করে সেই আশা নিয়ে রয়েছেন, খান তিনেক চিঠি এল, তার মধ্যে মৃণালিনীর চিঠি নেই। তাই এক অন্যবদ্য সম্বোধন করে লিখছেন ঃ

'ভাই ছুটি',... 'ডাকের সময় ডাক এল - খান তিনেক চিঠি এল - অথচ তোমার চিঠি পাওয়া গেল না। যদিও আশা করি নি তবু মনে করেছিলুম যদি হিসেবের ভুল করে দৈবাৎ চিঠি লিখে থাক। দূরে থাকার একটা প্রধান সুখ হচ্ছে চিঠি —

দেখাশোনার সুখের চেয়েও তার একটু বিশেষত্ব আছে।.. বাস্তবিক মানুষে মানুষে দেখাশুনার পরিচয় থেকে চিঠির পরিচয় একটু স্বতন্ত্র — তার মধ্যে এক রকমের নিবিড়তা গভীরতা একপ্রকার বিশেষ আনন্দ আছে।'

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের বহুকেন্দ্রিক সমুজ্জ্বল প্রতিভার নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে, অনুভূতির নানা স্তরীয় অনুভবে, ঘটনার সংঘাতে ও সমন্বয়ে এবং প্রকৃতির লীলা মাধুর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এর সবগুলিকেই আমরা জীবন্ত সাকার রূপে দেখি।

প্রথমে প্রকৃতি ও চিঠি দিয়ে শুরু করা যাক। ১৮৯৫ ১০ই জুলাই শিলাইদহ থেকে লিখছেন (ছিন্নপত্র) ঃ

'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার, গুরু গুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার আর জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি, উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে। ছোটো নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে - মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দ স্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি।...'

এ যেন শব্দের তুলি দিয়ে এক একটা ছবি আঁকার মতো সচল ও প্রবাহমান ক্ষণ বা এক একটা জীবন্ত মুহূর্ত। কিংবা রাতের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্না ভেঙ্গে পড়ার মতো অন্য এক দৃশ্য। সেদিন সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথ একখানা ইংরেজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা-সৌন্দর্য-আর্ট প্রভৃতি 'মাথামুণ্ড' নানা কথার নানা তর্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। বইটা বন্ধ করে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে শুতে যাবেন, দেখেন বোটের জানালা দিয়ে জোৎস্না একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ

...'হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙ্গে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম! সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।... (১৮৯৫ ১২ ডিসেম্বর, ছিন্নপত্র)।

তার ক'দিন আগে একই বছরে (১৮৯৫ ৬ই ডিসেম্বর) কালীগ্রাম থেকে নাগর নদীর ঘাট থেকে লিখছেন আর এক প্রাকৃতিক সমারোহের অসীম এক রূপছায়ার কথা ঃ

'কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারে পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করছে — কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা! কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী — আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে',...

এই যে প্রকৃতির নানা নিস্তব্ধ নিরালা ও সুনিবিড় রূপ — এটাই মানুষের হৃদয়ে অসীমের ছোঁয়া নিয়ে আসে। আর রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড় আধারের মানুষ হলে তিনি যে প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত বিশ্বভূখণ্ডের লীলাছায়ার খেলা দেখবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। সেই দেখার বিরাট পটছায়ায় রবীন্দ্রনাথকে দেখে হয়তো কখনও-বা আমাদের নিজেদের ছোট্ট ঘর ও ছোট্ট আকাশের শীর্ণ চেহারা মনে পড়ে যায় আর তখন আমরা আমাদের ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াই আর রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে পাই ঃ (১৮৯৪, ২৮শে নভেম্বর, শিলাইদহ) ঃ

'দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে — তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবী করি নে — কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই, যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই — কেবল একটা উদাস কঠিন নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা।... সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একা।'

(৯ জুলাই ১৮৯৫ পাবনা পথে) 'এই আঁকাবাঁকা ইচ্ছামতী নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি বর্ষাকালের নদীটি - এই যে দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম - এ যেন একই কবিতার কয়েকটি লাইন, আমি বারবার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং বারবারই ভালো লাগছে।...'

একই বছর একই মাসের ২ তারিখের দৃশ্য কীভাবে কাজ করছে তাঁর মনে, তারই চিত্র।

'কাজ করতে করতে কোনো এক দিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই, নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমাদের ঘরের লাগাও হাজির - যেন প্রকৃতিসুন্দরী কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে...

নদী দেখছেন, দেখছেন নীল আকাশ, দেখছেন কাশবন, গোধূলিলগ্ন, কাগজের নৌকোর মতো এক একটি দিন তাঁকে যেন ভাঙ্গিয়ে নিয়ে চলেছে। কখনও এক আধটি গান লিখছেন, কখনও লেখা ছেড়ে শরৎকালীন প্রহরগুলি মনের

মধ্যে সর্বব্যাপী স্তব্ধতায় ভরে যাচ্ছে — যেন সব কিছু ছুঁয়ে 'একটি সকরুণ শান্তি' তাঁর ললাটের উপর চুম্বন করছে। কখনও বা 'অভিমানিনা প্রবাসসঙ্গিনী' করুণ অনিমেষ নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে, বলছে, 'আমি যে তোমার চিরদিনের সাধনা... 'অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা।'

চিঠিপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত জীবনের সন্ধান পাননি, তাঁর চিঠিপত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বিভিন্ন চিঠিতে যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, তা লক্ষ্যণীয়ভাবে এখনও প্রাসঙ্গিক। মানসিক পত্রের সংখ্যা বাড়ছে আর তাদের ফর্মা বাড়াবার দৌড়াদৌড়িতে তিনি 'নতুনত্ব' দেখতে পাচ্ছেন না। তবে 'প্রবাসী জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেচে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে।' একই চিঠিতে (১৯৩১, তারিখ নেই) সবুজ পত্র-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বলছেন। 'সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এ জন্যে যে সাহস যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে তার সম্পূর্ণ গৌরব একা প্রমথনাথের (প্রমথ চৌধুরীর)।

নিজে বহু বছর সম্পাদকগিরি করেছেন বলেই সুধীনচন্দ্রকে সাবধান করে বলছেন .... 'সাধারণের সঙ্গে যদি কারবার করতে হয় তবে সাধারণের দাবী অজস্র পরিমাণেই মেটানো চাই।.. তাই লোকচিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা জগৎ জুড়েই হালকা হয়ে গেছে।... এ ব্যবসায়ে যারা আছে তাদের মনে উচ্চ সংকল্প থাকলেও নিজের অজ্ঞাতসারে আদর্শ নীচ হয়ে আসে।'...

রবীন্দ্রনাথের ভাবনাজগৎ ও কাব্য থেকে তখনকার অনেক সাহিত্যিকেই অনেক কিছু নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার তাৎপর্য যে কতটা প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি কথায় তা অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছিলেন, নদীর এপার থেকে যেন ওপার দেখা। নামী লেখকের অনেকেই যতটা তাঁকে প্রশংসা করেছেন, সমালোচনা করেছেন আরও অনেক বেশি। জীবনানন্দ দাশ একটি প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক যেভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন তার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রও যে 'মূল্যবান জিনিস' তাও স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু নিজের লেখায় ও কবিতায় রবীন্দ্র-সরোবর থেকে অবাধে সমৃদ্ধ হয়েছেন, এমন স্বীকারোক্তি বোধকরি সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ স্বীকার করে যাননি। (১৯৩৫-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর) সুধীরন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন ঃ ...'আমার মতুন বইখানার মধ্যে প্রশংসার কোনো কারণ যদি সত্যিই আপনার চোখে পড়ে থাকে, তাহলেও তার জন্যে আমার আত্মপ্রসাদ অশোভন। কেননা এবারেও আপনার ছন্দ, আপনার শব্দ, এমনকি আপনার পদ, ভেঙে-চুরেই আমি আমার কবিতাগুলো লিখেছি, ... আপনার সৌন্দর্যসৃষ্টিই অবিনশ্বর, শত রকমের ভাগ-বাটোয়ারাতেও মর্য্যাদা ঘোচে না, বরং তারই অমৃত স্পর্শ পারিপার্শ্বিক আবর্জনাকে ঐশ্বর্য্যবান করে।...'

রবীন্দ্রনাথ এরকম স্বীকারোক্তিতে খুশি হতেন। সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম বই সম্বর্কে লিখেছিলেন, ... (তোমার এই বইয়ের) নিজে সমালোচনা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি ভীরু। পিছিয়ে ছিলেম তার কারণ এই, তুমি অসঙ্কোচে প্রকাশ্যে আমার কাব্য-ভাষা থেকে ভাষা নিয়ে ব্যবহার করেচ। পাছে কেউ ভাবে আমার সঙ্গে তোমার কাব্যগত সাম্প্রদায়িক যোগ আছে বলেই আমি তোমাকে পুরস্কৃত করচি এই আমার ভয় ছিল। বস্তুত যা তোমার নিজের কাজে লাগবে তাকে সর্বজন সমক্ষেই গ্রহণ করবার সাহস তোমার ছিল, কারণ সেইসব অলঙ্কার দিয়ে তোমার কাব্যের স্বরূপ কিছুমাত্র আচ্ছন্ন হয়নি।'..

কোন্ সাহিত্য টেকে, কার লেখা দিয়ে তার কালকে বিচার করা চলে, কোন ও কার প্রবন্ধ রসসরোবর, কোন সাহিত্যের উদার আহ্বান মনকে ছুঁয়ে যায়, উন্মোচিত করে — এসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেছেন বলেই কিংবা তিনি অতি মাত্রায় দূরদর্শী ছিলেন বলেই তাঁর চিঠিতে এর সব কিছু ধরা পড়েছে। সুধীন্দ্রনাথকে লিখছেন (১৯৩৫, ১২ জানুয়ারী) ঃ '... মানুষের স্বভাবের উপর প্রকৃতির প্রভাব এমন ভাষায় তিনি (ওয়ার্ডস্বার্থ) বর্ণনা করেচেন তার সৌকুমার্য্য আমাকে মুগ্ধ করে, আমার কানে এর যে সুর বাজে তাকে আমি খাঁটি বলেই জানি। মানুষের অন্তরে বাহিরে সুরের সঙ্গে সুরের মিলন ইংরেজি সাহিত্যে এই প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে বেজে উঠেচে। কীটসের কাব্যের যাদু অল্প বয়সে মনের মধ্যে সোনার কাঠি ছুইঁয়েছিল, এখনো তার মোহ আমার মন থেকে ঘোচে নি। এযুগে শেলিকে তোমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক তার রচনায় মেকি কিছুই নেই একথা মানতেই হবে।.. শাওলা ঢাকা গভীর জলের Essay অনেক আছে.. কিন্তু ল্যাম্বের Eassy সাহিত্যস্বর্গের রসসরোবর, ওতে তারার আলোর সূক্ষ্ম হাস্যলীলা। নকলবাজেরা জাল ফেলে তা ধরতে পারলে না। হতে পারে এখনকার মতে টেনিসন তাঁর কাব্যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সগোত্র... কিন্তু টেনিসন বাহ্যত যতখানিই জায়গা জুড়ুন তাঁর মাপের তাঁর কালকে মাপা চলবে না।... আমার মতে সেদিন ইংরেজি সাহিত্যে আমার মন যে অবাধ প্রবেশ লাভ করেছিল তার কারণ ছিল সেই যুগের সাহিত্যের অন্তরে। তার মধ্যে সর্বজনীন আমন্ত্রণ ছিল, আতিথ্য ছিল।'

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে সমসাময়িককালের সর্বদিক উন্মোচিত হয়েছে। সব কিছু দেখাতে গেলে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আর দুটো দিক দেখিয়ে আমি শেষ করব। এক তাঁর হৃদয় — যেখানে যা কিছু কৃতিত্ব তা যদি ভারতের মর্যাদা বাড়ায় তিনি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। জগদীশচন্দ্র বসুর 'পরীক্ষার' জয় সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দে আপ্লুত হয়ে লিখছেন (১৯০২ এপ্রিল), 'আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে।...য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো — তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গ্যারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের... দারিদ্রতার মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে — তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে'...।

সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের কল্যাণের কথা, তাদের সাবলম্বী করার কথা নানা সময়ে ভেবেছেন, নিজেও অনেক কিছু করতে চেষ্টা করেছেন, সেই ব্যাপারে জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখছেন... 'রথীরা ফিরে এলে তার পরে ওদের কর্মক্ষেত্র ঠিক করে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ইচ্ছা এখানে প্রজাদের মধ্যে থেকে ও কাজ করে। কারণ, এই প্রজারাই ওকে শিক্ষার খরচ যুগিয়েছে, সেই ঋণ ওর শোধ করে দেওয়া কর্তব্য। (তখনকার কালে ক'জনই বা এরকমভাবে কৃষকদের কথা ভাবতেন) আবার বলছেন, '...আমার খুব ইচ্ছা, এদের সঙ্গে রথী cooperative system-এ কাজ করে।. অল্প মূলধনের small industries চালিয়ে দেওয়াই আমাদের দেশকে অনাহারে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার একমাত্র সদুপায় বলে আমার মনে হয়।'...

নগেন্দ্রনাথকে নিজের জীবনের দুর্যোগের মধ্যে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন...'আমি যখন বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম তখন আমার বয়স ৪০, আমার দেনা আশি হাজার টাকা, সম্পত্তির মধ্যে আমার বাড়ি, আত্মীয়দের বিরোধ অত্যন্ত প্রবল — তার মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যার দীর্ঘকালব্যাপী সাংঘাতিক রোগ - এ সমস্ত মাথায় করে নিয়ে এবং ঘর ও বাহিরের নিরন্তর প্রতিকূলতাকে রাতদিন ঠেলে ঠেলে আমি প্রকাণ্ড দায়িত্বের কাজ করেছি। তা নিয়ে ভাবনায় নিজেকে পীড়িত ও হতাশ্বাস হতে দিই নি।... তুমি যে সকল শিক্ষা ও সুবিধা পেয়েছ তোমার বয়সে আমরা তা পাইইনি তবে তোমার অসুবিধাগুলিকে অমন বৃহৎ করে দেখে চিত্তকে এরকম ভারাক্রান্ত করে তুলছ কেন?...'

আবার যখন কন্যা মীরার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার উপক্রম তখন লিখছেন (৮ ভাদ্র, ১৩২৬) ...'মীরার সঙ্গে তোমার লেশমাত্র বিচ্ছেদ হয় এ আমার কিছুতেই ইচ্ছাসম্মত নয়। এর দায়িত্বও আমার পক্ষে কঠিন। তবু আমাকে পরম দুঃখে এটা স্বীকার করতে হচ্চে। এবারে মাদ্রাজে যখন দেখলুম মীরা তোমাকে ভয় করে, তোমার হাত থেকে প্রকাশ্য অপমানের সঙ্কোচে একান্ত সঙ্কুচিত হয় তখন স্পষ্ট দেখতে পেলুম তোমাদের দুজনের প্রকৃতির মূল সুরে মিল নেই। সেই জন্যেই ভিতরে ভিতরে তোমরা এত সুদূরে গিয়ে পড়েচ।'

ঘরের ব্যক্তিগত কথা যেমন চিঠিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে, দেশের স্বার্থের ব্যাপারে এমন কথা যা বলার মতো হিম্মত অন্য কারুর নেই, তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (১৯শে এপ্রিল ১৯৩৪) ...'ইংরাজদের সঙ্গে কোমর বেঁধে সহযোগ চালাই বা অসহযোগ জাগাই, তাতে আমাদের সাধনা কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়। ওটা কলহমাত্র, সেই কলহের পরিণামে সার্থকতা নেই।... সেদিন আমার মনে এই একান্ত কামনা জাগছিল যে মহাত্মাজি নিজে চারিদিকে দেশের বিচিত্র শক্তিকে আহ্বান করবেন দেশের বিচিত্র সেবার কাজে। কারণ, দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য পূর্তকার্য বাণিজ্য — এই কর্তব্যগুলিকে প্রবল বলে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করাই যথার্থ দেশকে লাভ করা, জয় করা। সকলে মিলে কেবল চরকায় সূতো কাটায় দেশচিত্তের সম্পূর্ণ উদ্বোধন হতে পারেই না।...'

এবার রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সাধনা ও তাঁর জীবনদেবতা নিয়ে দু-একটা চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েই আমি লেখাটি শেষ করব, কারণ রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনার গভীর

তাৎপর্য যেমন আমরা 'কিছু-না' বলে ধরে নিই, তাঁর জীবনদেবতার মধ্যে তাঁর অন্তরের ব্যাপ্তি ও বিশ্বমানবতাতত্ত্বের মূল সুর মূলাধারে নিহিত সেটাও বেশ বড় গলায় অস্বীকার করি এবং অস্বীকার করি বেশ আত্মশ্লাঘায়। তাঁর চিঠিপত্রই এ ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত উপলব্ধিতে আসতে সহায়ক হবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেই (২৬শে আগস্ট, ১৯৩০) লিখছেন, 'বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে সেই জন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউবা আমাকে উপহাস করে কেউবা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানিনে আমি এসেচি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েচেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্ম্মাল্য ললাটে পরে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে, যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোষ পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর।'...

সারা জীবন অনেক কাজ করেছেন আর কাজের মধ্যেই বারবার নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন। বাইরের জগৎ থেকে মানুষ যা পায় তা রবীন্দ্রনাথ বিপুলভাবে নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে যিনি 'অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ' এবং যিনি 'চির জীবনের প্রিয়তম' তাঁর কাছেই গিয়ে প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হতে চাইছেন। ১৩১৭, ৭ই ভাদ্র, পতিসর থেকে (তখন ১৯১০ সাল হবে) প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠি লিখে মনের একথাটাই ব্যক্ত করছেন। তিনি বলেছেন, '... আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারিদিকে ফাঁস লাগায় নানা আবর্জনা জমে ওঠে — দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে — তখন... যিনি অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে... বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই।'

জীবনের শেষের দিকে সব দিক থেকে সার্থক এক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকেই লিখেছিলেন (১৩৩১, ১৯শে বৈশাখ)... 'যে ঘাট থেকে জীবন যাত্রা প্রথম শুরু করেছিলুম, আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপসা হয়ে আসছিল — কিন্তু এটা হল মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেচে। আলো কমে এল। এখন দেখতে পাচ্ছি ভোর বেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র।'...

১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিলে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন ...'জীবনের আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেছে. এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোঠে ফেরবার মুখে — বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসছে।'

রবীন্দ্রনাথের এসব চিঠি পড়ে আমরা সম্মোহিত না হয়ে পারি না। হৃদয়ঙ্গম করি দেশকে ভালোবেসেছিলেন বলেই দেশের অভাব-অনটন কোথায়, দেশের দুর্দশাটা কোথায় তার প্রয়োজনের মৌলিক কথাগুলো যেমন বুঝেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীকে আপন করে মানুষের ধর্মের স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছিলেন। জীবনকে সর্বাঙ্গিনভাবে দেখেছিলেন বলে অপরাহ্ন বেলার মধ্যে মুলতানি সুর শুনেছেন। মৃত্যুকে জীবনের অন্য এক রূপ হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের হিসাব নিতে গিয়ে তখনও খণ্ডের পর খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী লেখা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতেও লেখা হবে। আমরা অবশ্য চিঠিতে যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি আমাদের অনেক কাছের মানুষ। তবে তিনি আমাদের একজন হয়েও বিশ্বাসে ও তিতিক্ষায়, কর্ম ও সাধনায়, নিষ্ঠায় ও কর্তব্যবোধে আমাদের যেন ডাক দিয়ে যান, আমরা তখন বোধ ও বুদ্ধির পর্দা সরিয়ে জীবনকে নতুনভাবে দেখবার প্রেরণা পাই। জীবনকে অনুভূতি দিয়ে হৃদয় দিয়ে দেখতে শিখি। ❑

... আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে — লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়..

— ছিন্নপত্র, শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪